যুদ্ধোত্তর ইরাকে পুনর্গঠন বাণিজ্য
মুসলমানরা বাদ!

ইরাক যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন আরম্ভ হয়েছে পুনর্গঠন বাণিজ্য, যেখানে সবকিছুই দখল করে নিচ্ছে মার্কিনিরা। পুনর্গঠন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে কিছুটা আর্থিক লোকসান পোষানোর যে চিন্তা বাংলাদেশসহ মুসলিম প্রধান দেশগুলো করেছিল তা গুড়ে বালি হয়ে গেছে।...

লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনেরই জয় হলো। বস্তুত এরকম একটি অসম লড়াইয়ে ইরাক যে দিন পনেরোর বেশি লড়াই করেছে, প্রতিরোধ গড়েছে সেটাই অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কাছে এখন ইরাকের পুনর্গঠন অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে কোটি কোটি ডলারের বাণিজ্য। ইরাক আক্রমণকে যদি একটি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা যায় তাহলে এর থেকে প্রাপ্তির (অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলে ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন) প্রথম পর্যায়টি হলো পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় অর্থের যে লেনদেন হবে সেটি। আর দীর্ঘমেয়াদে এই প্রাপ্তি যোগ হলো ইরাকি তেল সম্পদের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন কোম্পানিগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার।

প্রেসিডেন্ট বুশ কংগ্রেসে যুদ্ধের জন্য যে হিসাব পাঠিয়েছিলেন তার পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ৫০ কোটি ডলার। পেন্টাগন সমীক্ষায় ৫ হাজার কোটি ডলার এবং কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার কোটি ডলার ব্যয়ের হিসাব দিয়েছিল।

বাংলাদেশের অর্থনীতি : আপাতত আশঙ্কামুক্ত

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে পুনর্গঠন বাণিজ্যে ভাগ নিতে বিভিন্ন দেশ এখন তৎপর হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই মার্কিনিদের সঙ্গে সুসম্পর্কের ভিত্তিতেই এই ভাগ-বাটোয়ারার ফয়সালা হবে। ভাগ জুটুক বা না জুটুক এর থেকে লাভালাভের বিষয়টি ছোট-বড় সব দেশই বোঝে। যে কারণে বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুদ্ধোত্তর ইরাক থেকে কিভাবে কিছুটা লাভবান হওয়া যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দেয়। যদিও বাংলাদেশের জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয় ছিল যুদ্ধের ফলে অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী কি প্রভাব পড়ে তা চিহ্নিতকরণ এবং সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত না হওয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে আপাতত আর তাৎক্ষণিক সংকটের কোনো আশঙ্কা নেই বলে ধারণা করা যাচ্ছে। অর্থনীতির দু'তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক থেকে এখন পর্যন্ত সেরকম আভাসই পাওয়া যাচ্ছে। যেমন মার্চ মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে হয়েছে ২৭ কোটি ৫১ লাখ ডলার যা ফেব্রুয়ারি মাসে ছিল ২৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার। অবশ্য একটা ধারণা করা হয় যে যুদ্ধেও আতঙ্কের কারণে প্রবাসী বিশেষত মধ্যপ্রাচ্য নিবাসী বাংলাদেশীরা অধিকহারে অর্থ দেশে পাঠিয়েছেন যেখানে তাদের সঞ্চিত অর্থের অংশের অনেকটা চলে এসেছে। ফলে রেমিট্যান্সে আসলে কতোখানি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা বোঝা যাবে এপ্রিল মাসের পর। আবার মার্চ মাসে জনশক্তি রপ্তানি না কমে বরং গত বছরের মার্চের তুলনায় প্রায় ২০% বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা এও মনে করছেন যে বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশীদের দেশে ফিরিয়ে আনার যে কথা ভাবা হয়েছিল তা আর এখন কার্যকর করার দরকার হবে না। ফলে রেমিট্যান্স প্রবাহ মোটামুটি স্থিতিশীল থাকবে। আর যুদ্ধচলাকালীন সময়ে যে কয়েক হাজার বাংলাদেশী দেশে ফিরেছে তাদের বেশিরভাগই ফিরেছে মূলত রুটিন ছুটিতে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে এখন স্থিতিশীলতা রয়েছে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের

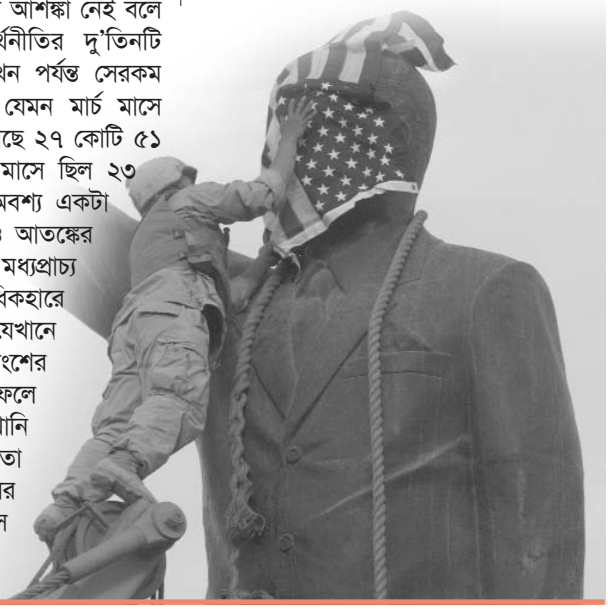

পরিমাণ ছিল ১৭৭ কোটি ৯৭ লাখ মার্কিন ডলার।

তবে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে এই যুদ্ধের যে প্রভাব বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে মোকাবেলা করতে হবে তা নিয়ে চিন্তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এমনিতেই রপ্তানি পরিস্থিতি খানিকটা নাজুক অবস্থায় রয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিলে বা মার্কিন অর্থনীতি কাঙ্ক্ষিত গতি ফিরে না পেলে বাংলাদেশকে এর জের বইতে হবে। সেক্ষেত্রে রপ্তানি আগের মতো জোরদার হবে না। ডলার দুর্বল হয়ে পড়লে রপ্তানি আয়ে স্বাভাবিক-ভাবেই নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। অবশ্য একই সঙ্গে আমদানি ব্যয়ও কমে যাওয়ায় কিছুটা ভারসাম্য ধরে রাখার সুযোগ থাকবে। তবে সমস্যা হবে যদি বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশীদার প্রধান দেশগুলো তাদের বাণিজ্যে পছন্দ-অপছন্দ বদলাতে শুরু করে। ইরাকে অন্যায্য আক্রমণের প্রতিবাদে বিভিন্ন দেশে বিশেষত মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে যেভাবে বিক্ষোভ-সমাবেশ হয়েছে ও হচ্ছে এবং যেভাবে পশ্চিমা বিরোধী মনোভাব তীব্র হচ্ছে তাতে ঐসব দেশগুলোও তাদের হীন মানসিকতার কারণে এসব দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছেঁটে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশেরও যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যুদ্ধ দীর্ঘায়িত না হওয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে আপাতত আর তাৎক্ষণিক সংকটের কোনো আশঙ্কা নেই বলে ধারণা করা যাচ্ছে। তবে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে এই যুদ্ধের যে প্রভাব বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে মোকাবেলা করতে হবে তা নিয়ে চিন্তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আরেকটি ধাক্কা আসতে পারে তেলের মূল্য বেড়ে গেলে। অবশ্য তেলের মূল্য বাড়বে না কমবে তা নিয়ে দু'ধরনের পর্যবেক্ষণ রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের স্বার্থেই তেলের মূল্য বর্তমানের চড়া দর থেকে নামিয়ে ফেলার জন্য সচেষ্ট হবে বলে ধারণা করা যায়। সেক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে তেলের দর কমবে। কিন্তু ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় তেলের দর বেড়ে গিয়েছিল ৯০% পর্যন্ত। আর এবার যুদ্ধোত্তর ইরাকে কার্যত কোনো স্থিতিশীলতা না আসা পর্যন্ত তেলের দরও স্থিতিশীল হবে বলে মনে করা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে দাম বাড়ার সম্ভাবনাই বেশি, যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকারক হবে। কারণ বাংলাদেশের মোট আমদানির ১০% ব্যয় হয় জ্বালানি তেল আমদানিতে, যার এক চতুর্থাংশ আমদানি করা হয় মধ্যপ্রাচ্য থেকে। তাছাড়া তেলের দাম বাড়লে জ্বালানি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন পণ্যগুলোর উৎপাদন ব্যয় ও দাম বেড়ে যাবে। ইতিমধ্যে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে জ্বালানি ও জ্বালানি জাতীয় পণ্য আমদানির যে পরিমাণ নতুন ঋণপত্র খোলা হয়েছে তা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩০% বেশি বলে হিসাব পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইরাকে মার্কিন আক্রমণকে হিসাবে রেখে যেমন এই আমদানি বেড়েছে, পাশাপাশি এক বছরের ব্যবধানে তেলের দাম বাড়ায় খরচও বেড়ে গেছে। অবস্থা যদি ১৯৯১ সালে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধপরবর্তী সময়কালের মতো হয় তাহলে বাংলাদেশের জ্বালানি তেলের আমদানি ১০% পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং এ কারণে ১৭ কোটি ডলার বাড়তি আমদানি ব্যয় বহন করতে হতে পারে।

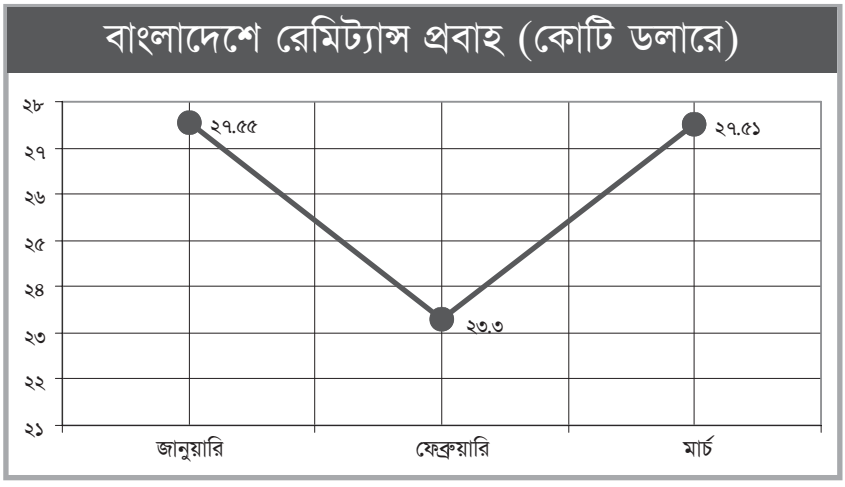

ইরাক পুনর্গঠন : মার্কিন কোম্পানির ভাগ-বাটোয়ারা

তবে যুদ্ধোত্তর ইরাকে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ করার সুযোগ একরকম নেই বললেই চলে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি প্রচেষ্টা নিতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে যুদ্ধোত্তর ইরাকে জাতিসংঘের ভূমিকার ওপরই বাংলাদেশের সম্ভাবনা নির্ভর করছে। কিন্তু এগুলোর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হলো মার্কিন-ব্রিটিশ মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই কুয়েতের একটি মার্কিন সেনা ঘাঁটিতে বেসামরিক কিছু লোক নিয়োগ করার জন্য ভারতের কয়েকটি

জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয় যে প্রার্থীকে অবশ্যই অমুসলিম হতে হবে। মজার বিষয় হলো, বিজ্ঞাপনদাতা ভারতীয় প্রতিষ্ঠান রেহমান এন্টারপ্রাইজ এন্ড কন্টিনেন্টাল মার্কেন্টাইলের নির্বাহীরা মুসলমান। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রধান আবদুর রহমান হিন্দুস্থান টাইমসকে জানিয়েছেন যে, তার প্রতিষ্ঠান কুয়েত-ভিত্তিক মারাফি কোম্পানির ভারতীয় প্রতিনিধি এবং মারাফির নির্দেশেই এই শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কেন এই শর্ত দেওয়া হলো তার জবাবে তিনি অসহায়ের মতো জানিয়েছেন যে তার কিই বা করার আছে।

এই ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করার কোনো কারণ নেই বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। কারণ, ইরাকে মার্কিন-ব্রিটিশ আগ্রাসনে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী ঘৃণামূলক ও হিংসাত্মক মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে এই মুসলিম বিরোধী কলকাঠি নাড়ছে ইহুদি চক্র। ইহুদি গোষ্ঠী খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং অনেকটা সফলও হয়েছে। ইতিমধ্যে ইরাকে অন্তবর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীকে নিয়ে আসার কথা ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। এভাবে ক্রমান্বয়ে মুসলিম প্রধান এই দেশে ইরাকিদের তো বঞ্চিত করা হবেই, বাইরে থেকে সাময়িকভাবে পুনর্গঠন কাজে যাদেও নিয়োগ দেওয়া হবে তারা মুসলিম না হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এভাবে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে মুসলমানদের দুর্বল করে দেওয়ার একটি সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের বিষয়টিও এখানে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ইউএসএ টুডে থেকে জানা যায় যে, মার্চের শেষ সপ্তাহেই যুদ্ধোত্তর ইরাকে পুনর্গঠনের কাজে

মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যাদের রাজনৈতিক যোগসূত্র জোরাল তারাই এসব কাজে অগ্রাধিকার পাচ্ছে তাও ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে গেছে। ডালাসভিত্তিক হ্যালিবার্টন ও সানফ্রান্সিসকোভিত্তিক বেচটেলের কথাই বলা যেতে পারে। হ্যালিবার্টন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির প্রতিষ্ঠান

অংশ নেওয়ার জন্য মার্কিন সাহায্য সংস্থা ইউএসএইড ৬০ কোটি ডলারের কাজ পেয়েছে যার মধ্যে রয়েছে জরুরি ভিত্তিতে সড়ক, সেতু ও রাষ্ট্রীয় ভবন পুনর্নির্মাণ। মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যাদের রাজনৈতিক যোগসূত্র জোরাল তারাই এসব কাজে অগ্রাধিকার পাচ্ছে তাও ইতিমধ্যে নিশ্চিত হয়ে গেছে। ডালাসভিত্তিক হ্যালিবার্টন ও সানফ্রান্সিসকোভিত্তিক বেচটেলের কথাই বলা যেতে পারে। হ্যালিবার্টন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন বড় বড় বিশেষত সামরিক নির্মাণ কাজের অভিজ্ঞতা অবশ্য এদের অনেক দিনের। সর্বশেষ আফগান যুদ্ধের সময় ১ কোটি ৬০ লাখ ডলারের কাজ পেয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান কিউবা উপকূলে গুয়েতেনামা বে-তে আফগান যুদ্ধবন্দিদের জন্য কারাগার নির্মাণের। হ্যালিবার্টন ও বেচটেলের সহযোগী প্রতিষ্ঠান কেল্লগ ব্রাউন এন্ড রুটস (কেবিআর) ইউএসএইডের নিলামে অংশ নিয়ে কাজ পেয়েছে। আরো কাজ পেয়েছে ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফ্লাউর এবং ওয়াশিংটন গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল অব বোজ।

দ্য সেন্টার ফর রেসপন্সিভ পলিটিকস জানিয়েছে যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ৩০ লাখ ডলার চাঁদা দিয়েছে যার বেশিরভাগই গেছে রিপাবলিকানদের ঘরে।

ইতিমধ্যে ইউএসএইডের কথিত নিলাম নিয়ে খোদ আমেরিকায় বিতর্ক দেখা দিয়েছে যে দরপত্র নিলামের নামে আসলে প্রহসন করা হয়েছে। কারণ, প্রকৃত অর্থে কোনো নিলামই হয়নি। ইউএসএইডের নির্বাহী এন্ড্রু নেটসিওস অবশ্য এই বলে এই অভিযোগ বাতিল করে দিয়েছেন যে ফেডারেল আইন অনুযায়ী জাতীয় নিরাপত্তাজনিত ক্ষেত্রে দরপত্র আহবানের কোনো প্রয়োজন থাকে না। বরং যেসব প্রতিষ্ঠানের এই ধরনের কাজের জন্য রাষ্ট্রীয় অনুমোদন রয়েছে এবং যারা কাজ দ্রুত করতে পারবে তাদেরকেই ডাকা হয়েছে।

কেল্লগ ব্রাউন এন্ড রুটস মার্চের শেষ সপ্তাহেই স্বীকার করেছে যে ইরাকে তেলকূপগুলোতে আগুন নেভানোর কাজটি তারা পেয়েছে এবং পেন্টাগন তাদেরকে গত বছর নবেম্বর মাসেই এ সংক্রান্ত প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছিল। কারণ হিসেবে তারা অবশ্য দাবি করেছে যে ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে এই কাজের অভিজ্ঞতা। কেবিআরকে অন্তত ৭০০ কোটি ডলারের কাজ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আরো কয়েকশ' কোটি ডলারের কাজ তারা পাবে। আর তেল সম্পদের বিশাল বাণিজ্য শেল এবং এক্সন মবিলকে দেওয়া হবে বলেও সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

অবকাঠামো পুনর্গঠনের চেয়ে রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসের কাজকেই বেশি পছন্দ করেছে ওয়াশিংটন গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল বোজ। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহেই তাদেও ভিপি জ্যাক হারম্যান বলে দেন যে তারা ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স থ্রেট রিডাকশন এজেন্সির কাছ থেকে এই কাজের জন্য দরপত্র প্রত্যাশা করছেন।

ইতিমধ্যে বহুল বিতর্কিত এবং বাংলাদেশের যার নাম কম-বেশি সবাই জানে সেই মার্কিন কোম্পানি স্টিভেডরিং সার্ভিসেস অব আমেরিকাকে (এসএসএ) উম্ম কসর বন্দর নির্মাণের জন্য ৪০ লাখ ৮০ হাজার ডলারের কাজ দেওয়া হয়েছে।

ইরাকে সিডিএম প্রযুক্তির মোবাইল ফোন চালু করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি কোয়ালকমকে এই ব্যবসা দেওয়া হবে। ক্যালিফোর্নিয়ার রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য ডেরেল ইসা ইতিমধ্যে কংগ্রেসে বিল এনে বিষয়টি পাকাপোক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। কারণ, তার নির্বাচনী প্রচারণায় কোয়ালকম যথেষ্ট বিনিয়োগ করেছিল। মার্কিনিদের ঔদ্ধত্য কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা এ থেকেই স্পষ্ট।

কোটি কোটি ডলারের কাজ অথচ সৌদি আরবের ৯০টির বেশি প্রতিষ্ঠান ১৮০ কোটি ডলারের কাজ পেতে ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী আরব দেশ হিসেবে পরিচিত সৌদি আরবের যখন এই অবস্থা তখন অন্যান্যদের যে কি হবে তা বলাই বাহুল্য।

যুদ্ধ পরবর্তী ব্যয়

(ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব)

ইরাকে মার্কিন সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণ : বার্ষিক ১ হাজার ৭০০ থেকে ৪ হাজার ৫০০ কোটি ডলার

পুনর্গঠন ব্যয় : মাথাপিছু ৮০০ ডলার হিসাবে পরবর্তী এক দশকে ১০ হজার থেকে ৬০ হাজার কোটি ডলার

মানবিক সাহায্য : ১০০ থেকে ১ হাজার কোটি ডলার

তেলে অতিরিক্ত ব্যয় : ৫০ হাজার কোটি ডলার পর্যন্ত যেতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যয় : ৩৪ হাজার ৫০০ কোটি ডলার

ইরাক যুদ্ধের ব্যয়

(ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব)

সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ :
৪ হাজার ৮০০ থেকে ৬ হাজার কোটি ডলার

দীর্ঘায়িত যুদ্ধ :
১৪ হাজার কোটি ডলার